প্রথম অধ্যায়

যুগপরিবেশ, সাহিত্য-আন্দোলন ও সমকালীন গল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব আধুনিক কালের ঘটনা।[১] বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় উৎপন্ন 'ব্যক্তি'র বিশেষ কোনো সমস্যা কি সংকটকে কেন্দ্রবিন্দু করে তাকে তীক্ষ্ণভাবে দেখার জন্য ছোটগল্পের চর্চা হয়ে আসছে আজ দেড়শো বছর ধরে।[২] আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বহুমাত্রিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও ঘটছে নানা রূপান্তর; ব্যক্তির সমস্যা এখন আর একরৈখিক নেই, নানা রকম অসংগতি ও অব্যবস্থা যেমন তার ওপর চেপে বসেছে, তেমনি সে নিজেও ছড়িয়ে পড়েছে ক্ষুদ্র গণ্ডি থেকে বিস্তৃত ভূগোলে। ফলে ব্যক্তির কোনো একটি বিশেষ সমস্যার সঙ্গে আধুনিক গল্পকে ধারণ করতে হচ্ছে তার একাধিক সমস্যা-সংকট। ব্যক্তিকে বৃহত্তর সামাজিক-রাষ্ট্রিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ করতে গিয়ে ছোটগল্পের বিষয় যেমন হয়ে পড়ছে বিস্তৃত, তেমনি আঙ্গিক-ভাষাও হয়ে উঠছে জটিলতর। বাংলা ছোটগল্প তার সৃজনকালের বৈশিষ্ট্য থেকে অনেক দূরে সরে এসে ক্রমে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য ধারণ করে নতুন নতুন পথে অভিক্ষেপ করে চলেছে।

বাংলা ভাষায় ছোটগল্প রচনার প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সফল ছোটগল্প রচিত হয় উনিশ শতকের শেষ দশকে।[৩] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা ছোটগল্পের প্রথম সফল নির্মাতা। দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে, বহু চড়াই-উতরাই পেরিয়ে বিষয়-আঙ্গিকের বৈচিত্র্যে, বহুমাত্রিক জীবনবোধের অন্বেষণে, শিল্পোৎকর্ষে বাংলা ছোটগল্প আজ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

লেখক সমাজ বিচ্ছিন্ন কেউ নয়, সমকালীন যুগপরিবেশ, রাজনীতি ও সমাজ অনিবার্যভাবে লেখকের ওপর প্রভাব ফেলে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসও এর ব্যতিক্রম নন। এ জন্য তাঁর গল্পের আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর জীবনোপলব্ধির স্বরূপ অন্বেষণের প্রয়োজনে একইসঙ্গে রাজনৈতিক-সামাজিক পটভূমি এবং সমকালীন সাহিত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অন্বেষণ জরুরি।

ছোটগল্পের লেখক হিসেবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের উত্থান বিশ শতকের ষাটের দশকে। এ দশক পাকিস্তানের রাজনীতিতে যেমন অত্যন্ত ঘটনাবহুল, তেমনি এ সময়ের পূর্ব বাংলার সাহিত্যকর্ম ও সাহিত্য-আন্দোলন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। একটু পেছনের দিকে ফেরা দরকার। ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক নিপীড়ন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে বৃহত্তর ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে যে স্বাধীনতা-আন্দোলন হয়েছে, সে আন্দোলনে রাজনৈতিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৬) বা সম্প্রদায়গতভাবে হিন্দু ও মুসলমান এক হতে পারেনি। লাহোর প্রস্তাবে (১৯৪০) তাই রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক আবাসভূমির প্রস্তাব করা হয়, পরিণামে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে ব্রিটিশ সরকার ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা (১৯৪৭) দেয়। ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে একটি ভ্রান্ত প্রক্রিয়ায় পাকিস্তান স্বাধীন হলেও সে সময় এ স্বাধীনতা পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের স্বপ্নের অন্তর্গত ছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তি তাদের আনন্দিত করেছিল। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির অব্যবহিত পরই পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভবনের কাজ শুরু হয়, শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা-ষড়যন্ত্র, সর্বত্র গণতন্ত্রের চর্চা হতে থাকে বাধাগ্রস্ত। রাষ্ট্রভাষা-ষড়যন্ত্রের কারণে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে সৃষ্ট পাকিস্তানের পূর্বাংশে ধর্মের চেয়ে ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দেয়। ১৯৫২ সালে ভাষার জন্য পূর্ব বাংলার মানুষ রাজপথে রক্ত দেয়। এই রক্তপাতের ঘটনা পূর্ব বাংলার বাঙালিকে মানসিকভাবে পাকিস্তান সৃষ্টির মৌল ভিত্তি থেকে (ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ঐক্য) বিচ্ছিন্ন করে ফেলে; ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-আচারে তারা হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত থাকার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে থাকে। অচিরেই মুসলিম লীগ পূর্ব বাংলার মানুষের আস্থা হারায়। ১৯৫৪ সালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট পূর্ব বাংলায় মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারির মধ্য দিয়ে শুরু হয় পশ্চিম পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের আরেক অধ্যায়।

১৯৪৭ সালের পরই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পাকিস্তানিকরণের প্রচেষ্টা চলে এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বর্জনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। আশাহত বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকগণ এই প্রয়াস সফল হতে দেননি। বাংলা সাহিত্যকে হাজার বছরের ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত রাখার জন্য তাঁরা 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ' গঠন করেন। উল্লেখ্য, সম্পূর্ণ চল্লিশের দশক পূর্ব বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীগণ ভুগছিলেন আত্মপরিচয়ের সংকটে; ফররুখ আহমদ (১৯১৮-৭৩), তালিম হোসেন (১৯১৮-৯৯) সৈয়দ আলী আহসান[৪] (১৯২২), প্রমুখের হাত দিয়ে কবিতাকে পাকিস্তানিকরণের প্রচেষ্টা চলে। ভাষা আন্দোলন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের আত্মপরিচয়ের সংকট থেকে মুক্তির পথ রচনা করে। কথাসাহিত্যে শওকত ওসমান (১৯১৭-৯৮), আবু রুশদ (১৯১৯-২০১০), সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-৭১); কবিতায় আহসান হাবীব (১৯১৮-৮৫), আবুল হোসেন (১৯২১), শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩), আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যনির্ভর ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত হন।[৫] ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ লেখকদের লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের সাহিত্য সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*। পঞ্চাশের দশকে পূর্ব বাংলার তরুণ কবি ও কথাসাহিত্যিকদের সচেতন প্রয়াসে বাংলাদেশের কবিতা ও কথাসাহিত্যের ভিত তৈরি হয়, চেতনার দিক থেকে তা অসাম্প্রদায়িক ও হাজার বছরের বাংলা সাহিত্য আর বাঙালির সংস্কৃতির পলি-জলে সিক্ত।[৬] ষাটের দশক এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালের বাংলাদেশের সাহিত্যচেতনার দিক থেকে তারই উত্তরাধিকার বহন করছে। আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের গল্পও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারত বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যচর্চা ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পর প্রাদেশিক রাজধানী হিসেবে ঢাকা বিকশিত হতে শুরু করে। রাজনীতির পাশাপাশি ঢাকায় শিল্প-সাহিত্যেরও এক নতুনতর বিকাশ শুরু হয়। ঢাকা ক্রমশ বেড়ে উঠতে থাকে বাংলা সাহিত্যের আরেকটি রাজধানী হিসেবে। যেসব কবি ও কথাশিল্পী প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে এসেছিলেন, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরই এসব সংবেদনশীল মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯২১) মধ্য দিয়ে

এই বঙ্গে যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ শুরু হয়েছিল, তাদের ভেতর সদ্য সৃষ্ট পাকিস্তানকে নিয়ে বেড়ে ওঠা আকাঙ্ক্ষাগুলোও নেতিয়ে পড়ে।

সমগ্র বাঙালি মুসলমান কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে প্রথম আধুনিক কথাসাহিত্য চর্চিত হয়েছে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর হাতে। শওকত ওসমান, আবু রুশদ প্রমুখ হয়েছিলেন তাঁর সহযাত্রী। পঞ্চাশের কথাসাহিত্যিকেরা তাঁদেরই অনুসরণ করেছেন প্রধানত, তবে এ দশকের উল্লেখযোগ্য ঘটনা কথাসাহিত্যে মার্ক্সবাদী চিন্তাচেতনার বিকাশ। আলাউদ্দিন আল আজাদের *জেগে আছি* (১৯৫০) গল্পগ্রন্থে তাঁর স্পর্শ পাওয়া যায়। এ সময় গল্প লিখেছেন সরদার জয়েনউদ্‌দীন (১৯১৮-১৯৮৬), শাহেদ আলী (১৯২৫-২০০১), আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩), সুচরিত চৌধুরী, (১৯২৯-১৯৯৪) আবদুল গাফফার চৌধুরী (১৯৩১), হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-৮৩), সৈয়দ শামসুল হক (১৯৩৫), বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর (১৯৩৬) প্রমুখ। পঞ্চাশের দশকের গল্পলেখকদের প্রবণতা ও এ সময়ের গল্পের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন আহমদ কবির এভাবে :

> তাঁরা ছিলেন প্রবলভাবে জীবনবাদী ও সমাজ সংলগ্ন। তাঁদের গল্পের বিষয়ে যেমন দেশবিভাগ-পূর্বকালের জীবনচিত্র রূপায়িত তেমনি আছে বিভাগ-পরবর্তীকালের। উদ্বাস্তু সমস্যা, মন্বন্তর, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, দাঙ্গা ইত্যাদি নিয়ে তাঁরা গল্প লিখেছেন, তবে প্রাধান্য পেয়েছে বাংলাদেশের গ্রামজীবন। গ্রামের বা শহরের যে ধরনের বিষয় তখনকার গল্পলেখকেরা অবলম্বন করুন না কেন, গল্পে যাপিত জীবনের সংকট ও সমস্যার আলেখ্যই তাঁরা রচনা করেছেন। কোনো কোনো শিল্পীর রচনায় শ্রেণী সংগ্রামও প্রমূর্ত হয়েছে।[৭]

পঞ্চাশের দশকের আশাহত কথাসাহিত্যিকেরা নিস্তরঙ্গ গ্রামজীবনে স্বস্তি খুঁজেছিলেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি হওয়ার পর গ্রামেও তার তরঙ্গ অনুভূত হতে শুরু করে। হতাশ মধ্যবিত্ত আর শিক্ষিত বেকার শ্রেণী ঝুঁকতে থাকে অবক্ষয়ের দিকে। নাগরিক জীবনে নেমে আসে ক্লেদ, ভণ্ডামি। পুরো ষাটের দশক একটি অনিশ্চয়তার দশক, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের দশক, নিরন্তর আন্দোলন-সংগ্রামের দশক। স্থিতি ও স্বস্তিহীন এ দশকে গল্পলেখক হিসেবে আবির্ভূত হন শওকত আলী[৮] (১৯৩৬), হাসান আজিজুল হক[৯] (১৯৩৯), বশীর আলহেলাল (১৯৩৬), জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত (১৯৩৯), মাহমুদুল হক (১৯৪০), রাহাত খান (১৯৪০), আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩) আখতারুজ্জামান ইলিয়াস (১৯৪৩), শহীদুর রহমান (১৯৪২-১৯৯২), কায়েস আহমেদ (১৯৪৮-১৯৯২) প্রমুখ।

ষাটের দশকের উপর্যুক্ত লেখকেরা এবং এ সময়ের কবিরাও[১০] ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের শিকার। এ সময় সামরিক শাসনের কারণে গণতন্ত্রের চর্চা ও শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বপ্ন ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। ১৯৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বহিষ্কারের পর শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বন্দী করা হয়, কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান হরণ করেন জনগণের মৌলিক অধিকার, সংবাদপত্রের ওপর আরোপ করেন সেন্সরশিপ, ৭ হাজার নেতা-কর্মীকে রাজনীতি থেকে অবসর প্রদান করেন,[১১] মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে করেন কুক্ষিগত। আইয়ুব খানের শাসনামলে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রবল হয়ে ওঠে। বাঙালিরা সরকারের উচ্চপদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে পশ্চিম পাকিস্তানের ভূস্বামী ও বুর্জোয়া-প্রভাবিত শাসকগোষ্ঠীর হাতে। ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় ছাত্রদের আন্দোলন শুরু হয় নতুন উদ্যমে। আইয়ুব খান সরকারের কার্যকলাপের বিরোধিতা ক্রমশ আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যায়। রাজনীতি ছিল নিষিদ্ধ, অসংখ্য নেতা-কর্মী কারাগারে; যাঁরা বাইরে ছিলেন, তাঁদের অনেককে দেওয়া হয়েছে বাধ্যতামূলক অবসর—এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে ছাত্ররা নিজেদের দূরে রাখতে পারেননি। তাঁরা আন্দোলনে নামেন, তাঁদের হাতেই মূলত এ সময়ের আন্দোলন গড়ে ওঠে। আইয়ুব সরকারের শিক্ষানীতি বাতিল, জাতিগত নিপীড়ন বন্ধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ছাত্ররা আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন।[১২] তাঁদের এই আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে জাতীয়তাবাদী চেতনা।[১৩] '৬৪ সালের ছাত্রদের ২২ দফা আন্দোলন, '৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন, '৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং এর প্রতিবাদে গড়ে ওঠা তুমুল আন্দোলন অবশেষে '৬৯-এ গণ-অভ্যুত্থানের রূপ নেয়। '৬৯-এর আন্দোলন সম্প্রসারিত হয় শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে।

আন্দোলন গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে এবং থানা আক্রমণ, মুসলিম লীগের অফিস দখল ও সাধারণ মানুষের শত্রু চোর-ডাকাত-জোতদার-মহাজন-তহশিলদার হত্যা শুরু হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মৌলিক গণতন্ত্রীদের পদত্যাগের খবরও ঢাকায় আসতে শুরু করে। প্রকৃতপক্ষে শহর এলাকার বাইরে মুসলিম লীগের ও সরকারের প্রভাব নষ্ট হয়ে যায়।[১৪]

সরকারি নিপীড়ন-ষড়যন্ত্র, ছাত্র-জনতার আন্দোলন-সংগ্রামে এভাবে পুরো ষাটের দশকে বাংলাদেশ ছিল মুখরিত। এ অস্থিতিশীল অবস্থা মানুষের

মধ্যে, বিশেষত, মধ্যবিত্তের মধ্যে যে অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে, তার গভীর প্রভাব পড়েছে এ দশকের বাংলাদেশের সাহিত্যের ওপর। '৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভের পরও এই অনিশ্চয়তা কাটেনি, শেষ হয়নি ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই নির্বাচিত আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা না দিয়ে পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর প্ররোচনায় জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব বাংলার মানুষের ওপর সামরিক বাহিনী লেলিয়ে দেন ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ।

ষাটের দশকে শিক্ষিত তরুণ, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিকদের রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র এবং সামরিক শাসন যেমন বিচলিত করে, তেমনি বিচলিত করে সাংস্কৃতিক আঘাতও। ভাষা নিয়ে ষড়যন্ত্র ষাটের দশকেও অব্যাহত ছিল, এ সময় শুরু হয় পূর্ব বাংলার মানুষকে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের চেতনা থেকে বিচ্যুত করার ষড়যন্ত্র। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল রবীন্দ্রনাথকে বর্জনের সিদ্ধান্ত, বাংলা ভাষা সংস্কার ও পাকিস্তানি ভাষা সৃষ্টির উদ্যোগ এবং রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির জন্য নজরুলকে খণ্ডিতভাবে উপস্থাপনের প্রয়াস। সব ষড়যন্ত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হলেও তা সংবেদনশীল তরুণ লেখকদের ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল, তাঁদের মধ্যে অস্থিরতা ও অশান্তি ছড়িয়েছিল।

পূর্ব বাংলায় রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে আমরা বলেছি, ষাটের দশকের লেখকেরা এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়ের শিকার। ষাটের দশকে এই ঝঞ্ঝা ও বিক্ষোভ কেবল বাংলাদেশেই দেখা দিয়েছিল তা নয়, বিভিন্ন কারণে পৃথিবীব্যাপী একটি অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। এটা কোনো মহাযুদ্ধ নয় বটে, কিন্তু একদিকে মূল্যবোধের ভাঙন, অস্থিরতা, হতাশা বিশ্বব্যাপী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত তরুণদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের জন্ম দিয়েছিল, অন্যদিকে প্রতিক্রিয়াশীলতা ও রক্ষণশীলতার বিরোধিতা স্থির বিশ্বাস ও প্রচলিত প্রথাকে আঘাত করেছিল। প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করার প্রবণতা এ সময়েই তৈরি হয়। 'এ সময় ইওরোপ ও আমেরিকায় পুরনোকে ভেঙ্গে দেবার পালা চলে পুরোদমে। তার জের চলে এই উপমহাদেশেও।'[১৫] আর্থসামাজিক ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠানের নানা রকম হঠকারিতায় ক্ষুব্ধ পূর্ব বাংলার তরুণ সাহিত্যকর্মীরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। 'তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় অনিবার্য। স্পেংলারের সূত্র থেকেই তাঁদের মধ্যে এ ধারণার জন্ম হয়েছিল।'[১৬] এ ধরনের চিন্তার আলোড়নের ফলে এ সময় পশ্চিমবঙ্গে এক সাহিত্য-

আন্দোলনের সূচনা হয়; আন্দোলনকারীরা নিজেদের অভিহিত করেন হাংরি জেনারেশন নামে। হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত নন্দলাল শর্মা বলেন :

> ষাটের দশকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় একই সময়ে শহরে তরুণ-তরুণীদের ভিতরে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা যায়—তাদের আপন আপন দেশের সমাজ, প্রচলিত ধর্ম ও নিয়ম, আর্থিক ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সবকিছুই তরুণ-তরুণীদের কাছে অসহনীয় সে কারণে বর্জনীয় মনে হয়। প্যারিস, বার্লিন, প্রাগ থেকে কলম্বিয়া, জাকার্তা, পিকিং বিভিন্ন শহরে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এই বিক্ষোভ সমকালীন সাহিত্যেও প্রকাশ পায়।[১৭]

পাকিস্তান সৃষ্টির (১৯৪৭) পর পূর্ব বাংলায় অস্তিত্বের প্রশ্নে যে রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হয়, তা চূড়ায় পৌঁছে ষাটের দশকে। এই আন্দোলন-সংগ্রামের কালে সচেতন যুবসম্প্রদায় আক্রান্ত হয় নিঃসঙ্গতার বোধে, লেখক-চৈতন্যকে এই নৈঃসঙ্গ বিক্ষুব্ধ করে তোলে; তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীলতা-বিরোধী মনোভাব, অন্ধ আভিজাত্য ও আস্ফালনের প্রতি ক্ষোভ দানা বাঁধে।

> তাঁদের পরিবর্তিত লেখক-চৈতন্য বাতিল করে পুরনো সাহিত্যাদর্শের প্রচলিত রীতিনীতি। রাষ্ট্রশাসকের ভেদনীতির যথেচ্ছ ব্যবহার ও চাপে ছিন্ন হয়ে যাওয়া বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকারের পুনরুদ্ধার ঘটে এবং ষাটের দশকের লেখকেরা পাকিস্তানের সরকারি সংস্কৃতি খারিজ করে দেন।[১৮]

পশ্চিমবঙ্গের হাংরি আন্দোলন ছিল মূলত কবিতাকেন্দ্রিক, গল্পলেখকের সংখ্যা ছিল কম। কোনো নামে চিহ্নিত না হলেও পূর্ব বাংলায়, ঢাকায় একইসঙ্গে কবিতা এবং গল্পকেন্দ্রিক আন্দোলন হয়েছে। ঢাকায় ছোটগল্প নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য *ছোটগল্প* (১৯৬৬, সম্পাদক : কামাল বিন মাহতাব) নামেই একটি ছোটকাগজ বের করা হয়েছিল।[১৯] আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত *কণ্ঠস্বর* (১৯৬৫) ঘিরে ভিন্ন ধারার সাহিত্য-আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে এই দশকেই। *কণ্ঠস্বর* প্রতিষ্ঠানবিরোধী সাহিত্য-আন্দোলনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে।[২০] *সমকাল* (১৯৫৭) *পূর্বমেঘ* (রাজশাহী), *উত্তরণ* (১৯৫৮), *স্বাক্ষর* (১৯৬৩) একইসঙ্গে এই মানসিকতাকে বেগবান করেছে।

> ষাটের দশকে বেশ কয়েকটি লিটল ম্যাগাজিন নতুন সাহিত্যাদর্শ প্রতিষ্ঠায় অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে। গতানুগতিক সাহিত্যে ধাক্কা দেয়ার জন্য নতুন মেজাজের লিটল ম্যাগাজিনগুলি লেখকদের পরীক্ষা-নিরীক্ষাপ্রবণ ছোটগল্প রচনায় উৎসাহের জোগান দেয়। এ সময় কবিরাও হয়ে ওঠেন দ্রোহী, যন্ত্রণাকাতর। ষাটের দশকে লিখিত কবিতা অত্যন্ত সমকাললগ্ন।[২১,২২]

কণ্ঠস্বর-এর এই আত্মকথন থেকে এ সময়ের সাহিত্যের একটা পরিচয় পাওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, এ সময়ের কথাসাহিত্য এর অন্তর্ভুক্ত, এবং এই আত্মকথন মূলত সমকালের কবি ও কথাসাহিত্যিকদের দ্রোহী চৈতন্যের সারাৎসার :

> যারা সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যাঁরা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, যাঁরা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত, যাঁরা পঙ্গু, অহঙ্কারী, যৌনতাস্পৃষ্ট, কণ্ঠস্বর তাঁদেরই পত্রিকা। প্রাচীন মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, মূর্খ সাংবাদিক, পবিত্র সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত।[২৩]

রাজনীতির তরঙ্গাভিঘাত, বিদেশি সাহিত্য পাঠের প্রতিক্রিয়া, মধ্যবিত্তের নাগরিক জীবনের নৈঃসঙ্গ ও অবক্ষয়, সংশয় ও দুরাশা এবং হাংরি ও বিট জেনারেশনের প্রভাবে এ বঙ্গে ষাটের দশকে আলোচ্য আখতারুজ্জামান ইলিয়াসসহ অন্যান্য গল্পলেখক যেসব গল্প লিখেছেন, তার মূল স্রোত বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে পূর্ববর্তী দশকের গল্প থেকে নানাভাবে স্বতন্ত্র। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, পঞ্চাশের গল্পলেখকেরা লিখেছেন প্রধানত গ্রাম-পটভূমির গল্প। আধুনিক নগরের যাবতীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে ঢাকা গড়ে উঠছিল ষাটের দশকে, বিকশিত হচ্ছিল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। 'এই শ্রেণী কৃষি ও শ্রমজীবী বৃহৎ মানবগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, অন্যদিকে অর্থ, সম্পদ, ক্ষমতা, অর্থাৎ জীবনের নানা বৈভব ছিল তাদের অনায়ত্ত।'[২৪] তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল একদিকে না পাওয়ার হাহাকার, অন্যদিকে পাওয়ার জন্য নানা রকম স্বার্থপরতা। এই শ্রেণীর মূল অবস্থান যেহেতু নগরে, তাই তাদের জীবনকে গল্পের বিষয় করতে গিয়ে ষাটের গল্প প্রধানত নগর-পটভূমির গল্প হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে আধুনিক নগরের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছোটগল্পের উদ্ভব ঘটেছে এই ষাটের দশকে। নগর-পটভূমির বাইরে অর্থাৎ গ্রাম পটভূমির যেসব গল্প লিখিত হয়েছে এ দশকের গল্প লেখকের হাতে, তাতেও লক্ষ করা যাবে দৃষ্টির গভীরতা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুনতর মাত্রা।

বিভাগোত্তর কালের, অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকের গল্পের প্রেম-ভালোবাসা, একান্নবর্তী পরিবারের বিষয়-আশয়ের পরিবর্তে ষাটের দশকের হাসান আজিজুল হক, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস প্রমুখের গল্প ধারণ করেছে রাজনীতি, তার ক্ষয়, হঠকারিতা, মধ্যবিত্তের আত্মদ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমানতা, সুবিধাবাদ,

মনোজটিলতা আর ব্যক্তির অথৈ নৈঃসঙ্গ। জটিল মনোবিশ্লেষণ এসব গল্পলেখকের এক মৌল অর্জন।

পুরো চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকে ভাষা ও আঙ্গিকের নিরীক্ষায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ নিঃসঙ্গ। ষাটের কথাসাহিত্যিকেরা অধিকতর আঙ্গিক ও ভাষা-সচেতন। ভাষা ও আঙ্গিক-সচেতন লেখক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর সঙ্গেও তাঁদের ব্যবধান স্পষ্ট। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চলিত ভাষায়ও মাঝেমধ্যে লক্ষ করা যায় তৎসম শব্দের প্রাধান্য, ষাটের গল্পে তা লক্ষণীয় নয়। তবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াস ব্যঙ্গ করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন।

আমাদের উপর্যুক্ত বক্তব্যের সমর্থনে ষাটের দশকের কয়েকজন প্রধান গল্পলেখকের গল্পের ওপর একবার দ্রুত চোখ রাখা যেতে পারে। জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্পে রয়েছে ষাটের দশকের উন্মাতাল সময়ের চিহ্ন; নাগরিক জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা, মধ্যবিত্তের নৈঃসঙ্গ আর বেদনা। গ্রামের নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন নিয়ে তিনি লেখা শুরু করেছিলেন,[২৫] কিন্তু স্থিত হয়েছেন নগরে। আঙ্গিক ও ভাষার ক্ষেত্রে নিরীক্ষাপ্রবণ জ্যোতিপ্রকাশ ভাষা থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেয়েছেন মেদ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও আত্মকথনরীতির সাহায্যে তিনি উন্মোচন করেছেন চরিত্রের অন্তর্লোক, কখনো বা চেতনা-উদ্ভাসী টুকরো চিত্রকল্পের সাহায্যে তুলে ধরেন বিশেষ কোনো চরিত্রের অন্তঃসত্তা।[২৬] তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *দুর্বিনীত কাল*-এ(১৯৬৯) এই প্রবণতা চোখে পড়বে।

ষাটের দশকে প্রকাশিত হয় আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম গল্পগ্রন্থ *সত্যের মতো বদমাশ* (১৯৬৮)। এই বইয়ে তিনি মধ্যবিত্তের মানসিকতাকে ধরে রেখেছেন, তাদের সন্দেহপ্রবণ মনের অলিগলি ঘুরে এসেছেন। তাঁর চরিত্র একান্নবর্তী পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় শান্তির অন্বেষণায়, কিন্তু জীবনযাপনে শান্তি খুঁজে পায় না তারা, শান্তি পায় না বিচ্ছিন্নতায়ও ('সময়ের ঘর': *সত্যের মতো বদমাশ*)। 'সত্যের মতো বদমাশ' গল্পে মায়ের হাত ধরে বালক-সন্তান একটি রাজ্যে চলে আসে, সেখানকার যেসব দৃশ্য আমরা প্রত্যক্ষ করি, তাকে বুর্জোয়া ও সামরিক শাসন-শোষণ-পীড়িত নগর বলেই শনাক্ত করতে হয়। এভাবে প্রতীক ও সংকেতের ভেতর দিয়ে মান্নান সৈয়দ হয়ে উঠেছেন আধুনিক নগরের অব্যবস্থা, জটিলতা ও মধ্যবিত্তের অসুস্থতার ভাষ্যকার। তাঁর ভাষা কাব্যগন্ধী, মাঝেমধ্যে আকস্মিক উপমা প্রয়োগ করে প্রহেলিকা সৃষ্টি করতে ভালোবাসেন তিনি।

সমগ্র পৃথিবী ও বাংলাদেশের নষ্ট-উন্মাতাল সময়কে কেন্দ্র করে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল গল্পে, যে ভাষাগত নিরীক্ষা হয়েছিল, সেদিকে দৃষ্টি রাখলে শওকত আলী ও হাসান আজিজুল হককে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এ দুজনের দৃষ্টি সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ, জীবনোপলব্ধি গভীর। শওকত আলী সম্পর্কে হাসান আজিজুল হক বলেছেন : 'শওকত আলীকে দেখি—খুব কম দু-চারজনের মধ্যে ওঁকেই দেখি আধুনিকতার তরঙ্গে কিছুতেই গা ভাসাতে গররাজি।'[২৭] ভাষায় তিনি ষাটের নিরীক্ষাকে গ্রহণ করেননি, বিষয়েও শুরুতে থেকেছেন নগর থেকে দূরে; খেটে খাওয়া নিরন্ন অস্থিসর্বস্ব মানুষের বলয়ে। তাঁর প্রবণতার জন্য তাঁকে বলা হয়েছে সবচেয়ে নির্জন, স্বতন্ত্র।[২৮] কিন্তু প্রথম গল্পগ্রন্থ *উন্মূল বাসনায়* (১৯৬৮) প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রামের চিত্রের পাশাপাশি তাদের যৌনজীবনের প্রতি শওকত আলীর যে আগ্রহ, তা ষাটের দশকের গল্পলেখকদের যে মৌল দৃষ্টি, অর্থাৎ জীবনের চুলচেরা বিশ্লেষণ—তার অন্তর্গত। তাঁর গল্পে মানুষ জীবনযুদ্ধে পরাজিত, পঙ্গু, শোষণে জর্জরিত। *লেলিহান সাধ* (১৯৭৩) গ্রন্থে অব্যাহত শোষণের বিরুদ্ধে মানুষকে হয়ে উঠতে দেখি প্রতিবাদী। 'কপিল দাস মুর্মুর শেষ কাজ' গল্পে স্মৃতিভ্রষ্ট কপিল দাস অন্ধকারে যে তীর ছুড়ে দেয়, তা প্রতিবাদের নতুনতর সংকেত-ব্যঞ্জনা লাভ করে।

হাসান আজিজুল হক উত্তর বাংলার গ্রামকে পটভূমিতে রেখে গড়ে তুলেছেন তাঁর গল্পের ভুবন। নিজেকে দেশত্যাগ করতে হয়েছিল (১৯৫৪-এ বর্ধমান থেকে আসেন) বলে তিনি তাঁর গল্পে দেশত্যাগের ভয়াবহতা ও বেদনাকে ভাষা দিয়েছেন। সামাজিক-রাজনৈতিক অবক্ষয়ের কারণে ব্যক্তির অধঃপতন, মধ্যবিত্তের হঠকারিতা, বুর্জোয়াব্যবস্থার সংশ্লিষ্ট শ্রেণী স্বার্থরক্ষাকারী গোষ্ঠী ও রীতিনীতি একাকার হয়ে উঠেছে তাঁর গল্পে। হাসান ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করেছেন নীরবে। আপাতদৃষ্টিতে তাঁর বাক্যকে মনে হয় সহজ সাধারণ, কিন্তু গল্পে তাঁর প্রায় জটিলতামুক্ত বাক্যগুলো ধরে রেখেছে মানুষের মনের সঙ্গে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়াকে। ভাষার এই বৈশিষ্ট্যের কারণে তাঁর গল্পে মানুষ আর প্রকৃতি কখনো অভিন্ন সত্তায় লীন হতে চায়। *আত্মজা ও একটি করবী গাছ* (১৯৭৬) গ্রন্থের 'সুখের সন্ধানে', 'অন্তর্গত নিষাদ', 'আমৃত্যু আজীবন' ইত্যাদি গল্পের কথা এ ক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

মাহমুদুল হক শক্তি নিয়ে ষাটের দশকে গল্পলেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেও অবশেষে স্থিত হলেন উপন্যাসে। তাঁর গল্পের ভাষায় খাপছাড়া-খাপছাড়া একটি ভাব আছে, পাত্রপাত্রীদের সংলাপ শেষ না করার প্রবণতা

আছে, কিন্তু তাতে বক্তব্য অসম্পূর্ণ থাকে না। অন্য বস্তু বা বিষয়ের উপমার মধ্য দিয়ে বক্তব্য প্রকাশে তিনি আগ্রহী, তাতে চমক থাকে, কিন্তু চরিত্রের ভাবনার সঙ্গে চরিত্রের বাস্তবতা সব সময় মেলে না। 'সপুরা ও পরাগল' গল্পে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।[২৯] দম্ভ ও সম্মান বাঁচাতে মধ্যবিত্ত কতটা নিচে নামতে পারে, তার বিশ্বস্ত চিত্র আছে তাঁর গল্পে। একইসঙ্গে তাঁর গল্পে দেখি ষাটের দশকের সময়কে—রাজনীতি-মিটিং-মিছিল নিয়ে একদিকে উত্তেজনা বিরাজ করছে—অন্যদিকে গ্রাম থেকে আসা ক্ষুধার্ত নর-নারী সর্বস্বান্ত হচ্ছে নগরের টাউটদের হাতে। তাঁর গল্পে আধুনিক নগরের হাতে পঙ্গু, পেট ও শরীরের ক্ষুধা নিয়ে মানুষের নির্মমতর জীবনের যে আর্তনাদ রয়েছে, তার তুলনা পূর্বজ লেখকদের গল্পে বিরল।

সাইয়িদ আতীকুল্লাহর গল্প অত্যন্ত কাললগ্ন, যদিও একটিমাত্র গল্পগ্রন্থে তিনি নিঃশেষিত।[৩০] তাঁর গল্পে আধুনিক নগরের বিকাশমান বুদ্ধিজীবী, আমলা, ব্যবসায়ীদের জীবনযাপন ও চরিত্রের নানা দিক, মধ্যবিত্তের স্ববিরোধিতা হেয়ালিপূর্ণ ভঙ্গিতে[৩১] উপস্থিত। *বুধবার রাতে* (১৯৭৩) গল্পগ্রন্থের নামগল্পটি সামরিক শাসনামলে সৃষ্ট ষাটের দশকের শ্বাসরুদ্ধকর জীবনচিত্রকে মূর্ত করেছে।

ঢাকা নগরে জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা এবং যৌনজীবনের খোলামেলা বর্ণনা রাহাত খানের গল্পের বৈশিষ্ট্য। তাঁর চরিত্রেরা হয় দালাল, রক্ষিতা, হঠকারী রাজনৈতিক নেতা অথবা আদর্শহীন লেখক। *কণ্ঠস্বর*-এর আত্মকথনে যে ধরনের লেখককে অনাহূত বলা হয়েছে, রাহাত খান তাদের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁর সাবলীল ভাষা তাঁর গল্পের বক্তব্য-বিষয়কে নগ্নভাবে প্রকাশ করে। *অনিশ্চিত লোকালয়* (১৯৭২) গ্রন্থে এসব প্রবণতা ধরা পড়েছে।

ষাটের দশকের গল্পলেখকদের সঙ্গে বিলম্বে যুক্ত কায়েস আহমেদ তাঁর দুটি[৩২] গল্পগ্রন্থে পশ্চিম বাংলার হুগলি অঞ্চল, ঢাকা ও তার অদূরবর্তী গ্রামাঞ্চলের মানুষের জীবন তুলে এনেছেন। বিবমিষা, মৃত্যু, প্রতিবাদ—ষাটের দশকের গল্পের এসব প্রবণতা যেমন তাঁর গল্পকে সমৃদ্ধ করেছে, তেমনি পশ্চিম বাংলার নকশাল আন্দোলন, সামাজিক অস্থিরতা, খুন-ধর্ষণের নগ্ন উপস্থিতি তাঁর গল্পকে বিশেষত্ব দিয়েছে। সামাজিক অব্যবস্থা শোষণ-পীড়নকে তিনি স্পষ্ট করেছেন গল্পে। তাঁর ভাষায় রয়েছে গদ্য-পদ্যের আলোছায়া। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বহুমাত্রিক সংকটের পথে মানব-অস্তিত্বের সামগ্রিক রূপ অঙ্কনই তাঁর ছোটগাল্পিক-অভিযাত্রার মৌল-অন্বিষ্ট।[৩৩]

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে ষাটের দশকের উন্মাতাল প্লাবন ভয়ানকভাবে স্পর্শ করেছে। তিনি নগরের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের জীবন, মধ্যবিত্তের কৃত্রিমতা, অতৃপ্তি, আত্মদ্বন্দ্ব, অসহায়ত্ব, রাজনৈতিক নেতাদের হঠকারিতা, মনোবিকার ও স্বার্থপরতা উন্মোচন করেছেন গল্পে। পুরনো ঢাকার মানুষ, এই অঞ্চলের পথঘাট, ডাস্টবিন আর নর্দমার বিশ্বস্ত উপস্থিতির জন্য তাঁর গল্প বিশিষ্ট হয়ে আছে। প্রথম দুটি গল্পগ্রন্থ *অন্য ঘরে অন্য স্বর* (১৯৭৬) ও *খোঁয়ারি*তে (১৯৮২) উপরোল্লিখিত বিষয়-আশয় সরাসরি প্রত্যক্ষ করি। ইলিয়াসের স্বাতন্ত্র্য হলো, জীবনকে তিনি যতটা রূঢ়, কঠিন, সংঘাতময় অবস্থায় দেখেছেন, উচ্চবিত্ত-মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তকে—এক কথায় মানুষকে যতটা স্বার্থপর, নীচ, ঈর্ষাপরায়ণ ও ব্যর্থ দেখেছেন[৩৪], বাংলা গল্পের ইতিহাসে আর কোনো গল্পলেখক এভাবে এতটা দেখেননি। সমাজ ও রাজনীতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষের যে মনোবিকৃতি, তার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ইলিয়াসের তুলনা বিরল। তিনি জীবনকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন, তাকে সেভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন নিজস্ব ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি।

> আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের বর্ণনা অনেক সময় বীভৎস, গা শিরশির করা। একেবারে নিরেট গদ্যে তিনি জীবনের ভাষ্য রচনা করে যান। ঢাকাই কুট্টিদের ভাষা, তাদের গালিগালাজ ও খিস্তি-খেউড় তাঁর রপ্ত এবং সেগুলো তিনি অনায়াসে গল্পে মিশিয়ে দিতে পারেন।[৩৫]

বাংলা গল্পের এলানো ভাষার স্থলে, এই বঙ্গের লেখকদের মধ্যে প্রথম ঋজু ভাষাকে গ্রহণ করেছিলেন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ (১৯২২-১৯৭১), এরপর ষাটের দশকে আমরা পেয়েছি হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসকে। কিন্তু হাসান আজিজুল হকের ভাষায় মানুষের মনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে প্রকৃতিকে লীন করার যে প্রবণতা আছে, ইলিয়াসের ভাষায় তা নেই। বিস্তারিত বর্ণনার প্রবণতা আছে ইলিয়াসের, কিন্তু তাঁর প্রতিটি শব্দ-উপমা প্রকৃত অবস্থাকে নিস্পৃহভাবে তুলে ধরে। কোনো রকম আবেগগন্ধী শব্দকে প্রশ্রয় দেননি তিনি। চরিত্রের স্মৃতি-স্বপ্ন-মনোবিকার বর্ণনার ক্ষেত্রে সাধারণত তিনি গ্রহণ করেন ওই চরিত্রের স্থানীয় ভাষার শব্দরাজি। ফলে চরিত্রের ভাবনা-নিচয় এবং চরিত্রের সমাজবাস্তবতা একাকার হয়ে ওঠে। তিনি দ্রষ্টা, কিন্তু নির্মাতা নন; তাঁর শুরুর দিকের গল্পে রয়েছে হতাশা, তিনি ধীরে ধীরে উপনীত হয়েছেন আশায়; শুরুতে রয়েছে নগরের যন্ত্রণা ও ক্ষয়, ক্রমশ উপনীত হয়েছেন গ্রামের বঞ্চিত মানুষের জীবনতটে। ষাটের দশকের প্রবল রাজনৈতিক ও সামাজিক উত্তেজনার কালে তিনি কথাসাহিত্যের ভুবনে পা

রেখেছিলেন, তার পরে সত্তরের দশকের শুরুতে ১৯৭১ সালে সংঘটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর কালেও এ দেশের গ্রাম-শহরের বঞ্চিত জীবনে অব্যাহত থাকে পুরনো ধারা, '৭৫-এর পর থেকে সামরিক শাসন, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, গ্রামের অর্থে নগরের স্ফীতি, প্রান্তসীমার মানুষের সংগ্রাম ও স্বার্থপরতা—সবকিছুই নানাভাবে যুক্ত হয়েছে তাঁর গল্পে, তাঁর উপলব্ধির সারাৎসারে। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর গল্প এভাবে অর্জন করেছে সমগ্রতা, তাঁর জীবনোপলব্ধি পেয়েছে পূর্ণতা।

তথ্য-সংকেত

১. শিশিরকুমার দাশ: *বাংলা ছোটগল্প*, প্রথম পরিমার্জিত দে'জ সংস্করণ: কলকাতা, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-ভূমিকা-ক

২. আখতারুজ্জামান ইলিয়াস: 'বাংলা ছোটগল্প কি মরে যাচ্ছে?', *অমৃতলোক* ৬৯, শারদ ১৪০০, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পৃষ্ঠা-৯৪

৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ: 'বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ ; ছোটগল্প', *বাংলা সংস্কৃতির শতবর্ষ* ১৪০০, নারায়ণগঞ্জ; পৃষ্ঠা-২২৭

৪. সৈয়দ আলী আহসান পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার মূলধারার সঙ্গে যুক্ত হন, রচনা করেন 'আমার পূর্ব বাংলা'র মতো কবিতা।

৫. এঁদের রচনায় এই ভূখণ্ডের জনমানসের ছাপ পড়েছে অনিবার্যভাবে, তা-ও অন্বিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যময় ধারাবাহিকতার সঙ্গে। শামসুর রাহমানের (১৯২৯-২০০৬) প্রথম কাব্যগ্রন্থ *প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে*তে (১৯৬০) তাঁর সমকাল ও তাঁর ভূখণ্ডকে যেমন চেনা যায়, তেমনি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতার শব্দনির্মিতি ও প্রতিবেশের প্রভাবও সুস্পষ্ট।

৬. যেমন শওকত ওসমান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, আহসান হাবীব।

৭. আহমদ কবির: 'স্বাধীনতা-উত্তর কথাসাহিত্যের রূপান্তর: বিষয় ও প্রকরণ: প্রসঙ্গ-ছোটগল্প', *একুশের প্রবন্ধ '৮৮*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৮, পৃষ্ঠা-৩৮

৮. শওকত আলী অবশ্য পঞ্চাশের দশকের শেষেই লেখালেখি শুরু করেন, কিন্তু তাঁর পূর্ণ উত্থান ষাটের দশকেই।

৯. 'হাসান আজিজুল হকও লেখালেখি শুরু করেন পঞ্চাশের দশকের শেষে। কিন্তু লেখক হিসেবে নিজেকে তৈরি করার সিদ্ধান্ত তাঁর ১৯৬০ সালে। এ বছর সিকান্‌দার আবু জাফর সম্পাদিত *সমকাল* পত্রিকায় প্রকাশিত 'শকুন' গল্পের জন্য ব্যাপকভাবে আলোচিত হন।'

—মোহাম্মদ কামাল: 'হাসান আজিজুল হক: সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও

রচনাপঞ্জী', *বিজ্ঞাপনপর্ব*, হাসান আজিজুল হক সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৯৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা-১৮৪

১০. এ দশকে প্রকাশিত পূর্ববর্তী শামসুর রাহমান, এ দশকের নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান প্রমুখের কবিতায় এর সাক্ষ্য মিলবে। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থের নাম *বিধ্বস্ত নীলিমা*। নির্মলেন্দু গুণ তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম রাখেন *প্রেমাংশুর রক্ত চাই* (১৯৭০)

১১. সাঈদ-উর রহমান: *পূর্ববাংলার রাজনীতি-সংস্কৃতি ও কবিতা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩, পৃষ্ঠা-৬৫

১২. সাঈদ-উর রহমান: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮, উদ্ধৃত: কাজী জাফর আহমদ: 'বাষট্টির ছাত্র আন্দোলন', *বিচিত্রা*, ঈদসংখ্যা ১৯৭৭

১৩. সাঈদ-উর রহমান: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৬৮

১৪. সাঈদ-উর রহমান: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৯৭

১৫. মোস্তফা হোসেইন: 'শতবর্ষের লিটল ম্যাগাজিন, সাহিত্য পত্রিকা ও সংকলন', *জীবনানন্দ*, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৯৫ ঢাকা, পৃষ্ঠা-৩৫

১৬. মোস্তফা হোসেইন: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫

১৭. *জিজ্ঞাসা*, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা থেকে উদ্ধৃত, মোস্তফা হোসেইন: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৫

১৮. সুশান্ত মজুমদার: 'বাংলাদেশের ছোটগল্প: সাফল্য ও সম্ভাবনা', *মাটি*, গল্পসংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, ঢাকা। পৃষ্ঠা-৫৪

১৯. "আমাদের এই ঢাকা শহর থেকেই তখন একটা পত্রিকা, মানে লিটল ম্যাগাজিন বেরিয়েছিল এবং অনিয়মিত হলেও চলেছিল দীর্ঘদিন। জনাকয়েক তরুণ ও অতিতরুণ জুটেছিলেন, ছোটগল্প নিয়ে একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, পত্রিকার নাম রেখেছিলেন: 'ছোটগল্প'"।

—হায়াৎ মামুদ, 'চক্ষুষ্মান তীরন্দাজ', *কায়েস আহমেদ: নিরাবেগ বোঝাপড়া*, ঢাকা ১৯৯৪, সম্পাদক: সুশান্ত মজুমদার, পৃষ্ঠা-২৪

২০. মোস্তফা হোসেইন: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭

২১. সুশান্ত মজুমদার: প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৫৫

২২. এ সময় লেখা শামসুর রাহমানের কবিতা সময়কে তুলে ধরেছে এভাবে:

দশটি বাঙ্ময় পঙ্‌ক্তি রচনার পর একাদশ পঙ্‌ক্তি নির্মাণের আগে
কবির মানসে জমে যে-স্তব্ধতা, অন্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্র
থাবা থেকে গা বাঁচিয়ে বুকে
আয়াতের নক্ষত্র জ্বালিয়ে
পাথুরে কণ্টকাবৃত পথ বেয়ে ঊর্ণাজাল-ছাওয়া
লুকানো গুহার দিকে যাত্রাকালে মোহাম্মদ যে-স্তব্ধতা আস্তিনের ভাঁজে

একদা নিয়েছিলেন ভরে :

সে স্তব্ধতা বুঝি

নেমেছে এখানে।

—'হরতাল' : নিজ বাসভূমে (১৯৭০), *শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা*, তৃতীয় সংস্করণ, ঢাকা ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৭১

২৩. *কণ্ঠস্বর* (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত) থেকে উদ্ধৃত (সংখ্যা অনুল্লিখিত) : মোস্তফা হোসেইন; প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা-৩৭

২৪. সারোয়ার জাহান : *বাংলা উপন্যাস : সেকাল-একাল*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯১, পৃষ্ঠা-১৯৬

২৫. জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের গল্প 'কেষ্টযাত্রা', 'রংরাজ ফেরে না' গ্রামীণ পটভূমিতে লেখা।

২৬. বিশ্বজিৎ ঘোষ : প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-২৮৯

২৭. হাসান আজিজুল হক : 'শওকত আলী বন্ধুবরেষু', *নিসর্গ*, শওকত আলী সংখ্যা, মার্চ ১৯৯২, বগুড়া, পৃষ্ঠা-প্রবন্ধ-১০৯

২৮. ফারুক সিদ্দিকী : "শওকত আলী : ভগ্ন চিত্রকল্প ও 'লেলিহান সাধ' গল্পগ্রন্থ", *নিসর্গ*, প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-৫৬

২৯. মাহমুদুল হকের একমাত্র গল্পগ্রন্থ *প্রতিদিন একটি রুমাল* প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৪ সালে। এতে ষাটের দশকে লেখা গল্পের মধ্যে স্থান পেয়েছে 'সপুরা ও পরাগল' (রচনাকাল ১৯৬৪) এবং 'অচল সিকি' (রচনাকাল ১৯৬৩)

৩০. *বুধবার রাতে* (১৯৯৪) সাইয়িদ আতীকুল্লাহর একমাত্র গল্পগ্রন্থ। ষাটের দশকের পর কবিতা তাঁর নিজস্ব এলাকা হয়ে ওঠে।

৩১. আহমদ কবির : প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-৪১

৩২. *অন্ধ তীরন্দাজ* (১৯৭৮), *লাশকাটা ঘর* (১৯৮৬)

৩৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ : প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-২৯২

৩৪. তৃতীয় গল্পগ্রন্থ *দুধভাতে উৎপাত* (১৯৮৫) থেকে তিনি অবশ্য মানুষের সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে শুরু করেছেন। তাঁর গল্প ধারণ করতে শুরু করেছে গ্রাম, সেখানকার মানুষের স্বার্থপরতা ও সংগ্রামকে।

৩৫. আহমদ কবির : প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা-৪৭